অধ্যায় ১২ : আধুনিক বাংলা গল্প পাঠ-২

বিন্যাস ক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ লেখক পরিচিতি
১২.৪ বিষয়বস্তু
১২.৫ গল্পটির বিশ্লেষণ এবং চরিত্র
১২.৬ নামকরণ
১২.৭ অধ্যায়টির পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৮ অতিরিক্ত পঠন
১২.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.১০ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পড়ে শিক্ষার্থীরা—

- গল্পকার জগদীশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জগদীশের গল্পশৈলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গল্পটির চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গল্পে উল্লিখিত দেশভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১২.২ পরিচিতি

'সম্পাদকের বৈঠকে' সাগরময় ঘোষ জগদীশ গুপ্তের লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "সে লেখায় সমাজ জীবনের বাস্তব রূপ রোষ কষায়িত ভঙ্গিতে ব্যক্ত। পড়ে চমকে উঠতে হয়। তার লেখায় শ্লেষ আছে, ব্যঙ্গ আছে, হাসি আছে আর আছে জীবন সংগ্রামের জর্জরিত একটি মানুষের দরদী দৃষ্টি।" 'বাংলা ছোট গল্পের তিন দিকপাল' প্রবন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "আমরা বুঝতে পারি এই লেখক সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন রস আনছেন, যাতে উদ্ভট রস বললেও ঠিক বলা যায় না, মোহিতলাল যাকে বলেছেন bizarre, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হলেও অভিনব। সত্য শিব সুন্দরের একেবারেই তোয়াক্কা করছেন একজন লেখক এমনটি আর আগে দেখা যায়নি।" 'জগদীশ গুপ্ত: কথাসাহিত্যের বিপরীত স্রোত' প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হক বলেছেন, "সত্যি বলতে কি সমস্ত বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের মতো আর কেউই এতো অবিচ্ছিন্নভাবে এতো রোখের সঙ্গে আগাগোড়া তিক্ত থাকেননি।.....কখনও তা পরিবারের গন্নির মধ্যে কখনও তা পরিবারের বাইরে আরও অসংখ্য ধরনের লেনদেনের মধ্যে থেকে যায়। আমরা দেখবো জগদীশ গুপ্ত এই সম্পর্কগুলিকে অর্থাৎ সমাজের ভিতরে

মানব সম্পর্কগুলিকে অত্যন্ত নগ্নভাবে তাদের প্রকৃত স্বরূপে দেখতে চেয়েছিলেন।" সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত।"

সাধারণভাবে জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট সাহিত্যলোক কঠোর নির্মম বাস্তবের জগৎ। সেখানে পয়সায় পাপ নেই। যেখানে মানুষ অর্থের পিছনে সারাক্ষণ ছুটে চলেছে। তাঁর গল্পের পাত্র পাত্রীরা জানে দু'টি বিষয়-- পয়সা আর দেহ। ফলে তাদের জগতে পাপ পূণ্য, বিবেক অবিবেক, ধর্মনীতির বিশেষ ভূমিকা নেই। তাই তারা স্বভাবতই নির্মম নির্বিকার ও নিষ্ঠুর। দস্তয়েভস্কির 'আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যান' বা বিমল কর যাকে বলেছেন 'জলের তলার মানুষ', তাকে লক্ষণীয় ভাবে আবিষ্কার করেছেন জগদীশ গুপ্ত। এটাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষ যতই সভ্য-ভব্য হোক না কেন, মনের গভীরে সে তার পাশব সত্ত্বাটাকেই ভালোবাসে। সেই স্তর থেকে খুব বেশি সে উন্নত হতে পারেনি। হয়তো চায়ওনি। বাংলা সাহিত্যে নারী পুরুষের সম্পর্কে যৌনতার দিকটি নিয়ে তিনি প্রথম আলোকপাত করেন। তার সাহিত্যেই আমরা প্রথম দেখলাম নারী নির্যাতিত বলেই সহজ সরল নয় বরং জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবর্তে সে দুর্বোধ্য। তার গল্পে নিয়তি কোন কর্মফল হিসেবে নয় বরং এসেছে অনিবার্যভাবেই। জগদীশ গুপ্ত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন পাপ পুণ্য, শুভ-অশুভের আলাদা মূল্যায়ন করেননি। আর এখানেই তিনি ব্যতিক্রম।

জেনে রাখুন

যা হলে ভালো হতো জগদীশ গুপ্ত তার লেখক নন। মানুষ তার কাছে দুঃখসম্ভব, দুঃখবিবর্ধিত। এবং দুঃখাত্মক। দুঃখপ্রাপ্তিই তাঁর দুঃখতত্ত্বের শেষ কথা।

১২.৩ লেখক পরিচিতি

১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার আমলা পাড়ায় জগদীশ গুপ্তের জন্ম। পুরো নাম জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ডাকনাম নারায়ণ। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার গোয়ালগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত মেঘচুম্বী গ্রাম। বাবা কৈলাস চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন কুষ্টিয়া আদালতের নামকরা আইনজীবী এবং বিখ্যাত ঠাকুর এস্টেটের আইন উপদেষ্টা। মা সৌদামিনী দেবী নিবিষ্ট সাহিত্য পাঠক ছিলেন। বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের রচনার সাথে তার পরিচয় ছিল যা জগদীশ গুপ্তকে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে প্রাণিত করেন। পিতামহ আনন্দমোহন গুপ্ত ছিলেন প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী। কুষ্টিয়ার রামলাল শাহার পাঠশালায় জগদীশ গুপ্তের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এরপর কলকাতার সিটি কলেজের স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে রিপন কলেজে (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন। মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখা। 'অক্ষরা' নামে একটি কবিতা সংকলন রয়েছে তাঁর। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা 'মির্জার স্বপ্ন দর্শন' (আষাঢ় ১৩৩৮)। এটি জোসেফ এডিশন রচিত ভিশন অফ মির্জার অনুবাদ। 'বিজলি' পত্রিকায় 'পেইং গেস্ট' নামে প্রথম ছোট গল্পের প্রকাশ (১৯৩১ সালে)। কালি কলম পত্রিকায় তিনি লিখতে শুরু করেন ১৯৩৩ থেকে। কথা

সাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত ন্যাচারালিজমের শিল্পী। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নয়—'বিনোদিনী'(১৩৩৪), 'রূপের বাহিরে'(১৩৩৬), 'শ্রীমতী'(১৩৩৭), 'উদয়লেখা'(১৩৩৯), 'উপায়ন'(১৩৪১), পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক '(১৩৪১), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী'(১৩৪২), 'তৃষিত সৃক্কনী'(১৩৩৯), 'মেঘাবৃত অশনি'(১৩৫৪)। জীবন সম্পর্কে দুঃসাহসী এক ভাবনা রয়েছে তাঁর প্রতিটি গল্পেই। পাঠকপ্রিয় বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে শুরু থেকেই অনীহা ছিল তাঁর। কল্লোল যুগের সাহিত্যিক হলেও কল্লোলীয় সাহিত্য আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে তিনি সরাসরি কখনওই যুক্ত হননি। প্রচারের বাইরে থেকে নির্জনে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সম্পর্কে জানাচ্ছেন, "অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তোবা অনুপস্থিতও বটে।" শরৎচন্দ্রীয় আবেগ ও কল্লোলীয় ভাবালুতাকে প্রথম থেকেই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন জগদীশ গুপ্ত। আধুনিক কথাসাহিত্যে তিনি শুরু থেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র। জগদীশ গুপ্ত তার সাহিত্যে মানব মনের অন্ধকার দিকটাই বেশি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। আটপৌরে মানুষের অন্তরও যে কতটা কলুষতায় ভর্তি বাংলা সাহিত্যে প্রথম তিনিই তা উদঘাটন করেছেন। লোভ, হিংসা, হিংস্রতা, আগ্রাসী যৌনতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, নিয়তির করাল গ্রাস তার গল্পে প্রবল যদিও অল্প সংখ্যক হাস্যকৌতুক গল্পও তাঁর রয়েছে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা মানবিক বোধে ততটা উজ্জীবিত নয় তারা একান্তই জৈবিক মানুষ। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, "মানুষ মাত্রেই মনে মনে স্বভাবতই অধার্মিক এবং মানুষ মাত্রেরই স্নায়ু রোগ ভিতরে থাকেই।" জগদীশ গুপ্তের গল্পকে মোটামুটি ভাবে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি—

(ক) যৌন জটিলতা ও যৌন অপরাধমূলক গল্প: 'চন্দ্র সূর্য যতদিন', 'আদি কথার একটি', 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী', 'বিধবা রতি মঞ্জরী', 'কলঙ্কিত সম্পর্ক', 'অরুপের রাস', 'শঙ্কিত অভয়া' ইত্যাদি।

(খ) স্বার্থ সর্বস্ব মানুষের নিষ্ঠুরতা ভিত্তিক গল্প; 'পয়োমুখম', 'পুরাতন ভৃত্য', 'মায়ের মৃত্যুর দিন', 'চার পয়সার এক আনা' ইত্যাদি।

(গ) নিয়তি ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ক গল্প: 'দিবসের শেষে', 'হাড়', 'তৃষিত আত্মা', 'দৈবধন' ইত্যাদি।

(ঘ) কৌতুক ও রোমান্টিক গল্প: 'আঠার' 'কলার একটি', 'কামাখ্যার কর্মদোষে' ইত্যাদি।

১২.৪ বিষয়বস্তু

জগদীশ গুপ্তের 'রূপের বাহিরে' গল্পগ্রন্থের 'চন্দ্র সূর্য যতদিন' নারীত্বের অবমাননা ও তার প্রতিবাদের গল্প। তিনি আমাদের গল্প শোনান একেবারে নতুন এক কণ্ঠস্বর নিয়ে, "পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া এবং জননীর অনুমতিক্রমে দীনতারণ তাহার শ্যালিকা প্রফুল্লকুমারীকে বিবাহ করিয়া আনিল। প্রথমা পত্নী ক্ষণপ্রভা মরিয়া তো যায়ই নাই উপরন্তু তাহার গর্ভে পুত্র সন্তানও জন্ম লাভ করিয়াছে। এক স্ত্রীর বর্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয় বিবাহ করিবার কারণ শ্বশুর মহাশয়ের সম্পত্তি। প্রফুল্লকুমারী অন্য ঘরে গেলে সম্পত্তির অধিকাংশ বাহির হইয়া যাইত, সম্পত্তিও সামান্য নয়।" আদরের বোন প্রফুল্ল সহসা সতীন হয়ে এল ক্ষণপ্রভার জীবনে, সে হল তার বিছানার শরীক। দুই বোনের আজন্মলালিত সম্পর্ক আর আগের মতো রইল না। স্বামীর যে মুগ্ধ দৃষ্টিকে সে ভুল করে ভেবেছিল স্ত্রীর মর্যাদা, তার পুত্র গর্ভে ধারণ করার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, নিজের বোনের প্রতি সেই স্বামীর লুব্ধ দৃষ্টি দেখে তার

ভিতটাই নড়ে গেল। সে উপলব্ধি করল ভালোবাসা বলে কিছুই নেই, "এই দেহটার দিকেই লক্ষ্য --- দেহের মাংস, চর্ম, দেহের বর্ণ।" এই বোধ থেকেই তার মনে জন্ম নিল ঘৃণা, "ক্ষণপ্রভার মনে হইতে লাগিল তাহার জীবন মিথ্যা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রীতি সব মিথ্যা। সর্বোপরি সন্তান ধারণ মিথ্যা। ভোগের ক্ষেত্র অবারিত পাইয়া স্বামী তাহাকে লইয়া কেবল খেলা করিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণপ্রভার মনে যে ভাবটি উদয় হইল সাধ্বীর পক্ষে তাহা মহাপাতকের কথা, স্বামীকে স্মরণ করিয়া ঘৃণায় মন গুলা ঘুলাইয়া উঠিল।" নিজের জন্য তার শুধু কষ্ট হল তা নয়, আদরের ছোট বোন প্রফুল্লকুমারীর সম্ভাব্য পরিণতির আশঙ্কায় সে কেঁপে উঠল, "প্রফুল্ল টিপ পরে, চুল বাঁধে— স্বামীর মনোরঞ্জনের অভিলাষটি তার সর্বাঙ্গ দিয়া উপছিয়া পড়ে— ক্ষণপ্রভা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে দেখিতে দেখিতে একদিন বুক দুরু দুরু করিয়া অকস্মাৎ উদ্ভূত একটা অতিশয় শঙ্কিত মমতায় ক্ষণপ্রভা বিগলিত হইয়া প্রফুল্লকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।" অন্যদিকে শাশুড়ি ভেবে বসলেন এ কান্না বুঝি মেয়েলি অধিকারবোধের তাড়ণাজাত। সেই যন্ত্রণায় প্রলেপ লাগাতে তিনি সেই রাত্রেই ক্ষণপ্রভাকে জোর করে স্বামী সহবাসে পাঠালেন। ক্ষণপ্রভার কোন আপত্তি টিকল না। জগদীশ লিখছেন, "এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন ঘিন করিতেছে।... অদূরবর্তী ওই লোকটা যেন কেবল একটা মাংসপিণ্ড--- যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ ,তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হাঁ করিয়া আছে।" কিছুতেই ছাড়া পেল না সে, "ছোট বোন বড় বোনের চেয়ে অবশ্যই কাম্য, তা সত্ত্বেও দেবতা তার প্রাপ্য অর্ঘ্য না আদায় করিয়া ছাড়িল না।" এই আঘাত সহ্য করতে পারেনি সে। উন্মাদ করে তুলেছে এই প্রেমহীন দাম্পত্য তাকে। তাই হঠাৎ গভীর রাতে মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙে দীনতারণ দেখল শয্যায় বড়ো বৌ নেই, ছেলেও নেই। দরজা হাট করে খোলা। প্রচুর খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল, "এখন সে নগ্ন দেহ সম্পূর্ণ উন্মাদ। কিন্তু ছেলেটি বুকেই আছে।"

১২.৫ গল্পটির বিশ্লেষণ এবং চরিত্র

'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পটি পড়ে আমরা চমকে যাই।কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। দুই বোন সতীন হিসেবে একই স্বামীর পত্নী হওয়া সেকালের সময়ে খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার জন্য এ ধরনের উন্মাদ হয়ে যাওয়া কৌতূহলের জন্ম দেয়। সাধারণ দৃষ্টিতে ঘটনাটি অসম্ভব। মধ্যবিত্ত গ্রামীণ বাংলা সমাজে জগদীশ গুপ্তের কালে এক স্বামীর দুই পত্নী একেবারে সাধারণ কথা। পত্নীরাও সাধারণত তা মেনে নিত। উনিশ বছরের ক্ষণপ্রভাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু প্রফুল্লের প্রতি তার স্বামীর পক্ষপাতিত্ব তাকে ভাবতে বাধ্য করে, "মেয়ে মানুষ কুড়ি পেরোলেই বুড়ি।" এখানেই লুকিয়ে আছে ক্ষণপ্রভার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের বীজ। যার ফল তার পাগল হওয়া। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে সমকালের ও পরবর্তীকালের পাঠক সমাজের যে বিস্মৃতি তার কারণ জগদীশ গুপ্ত কখনওই পাঠক মন জয় করার জন্য গল্প লেখেননি। তিনি নির্মম দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন সমাজের বাস্তব রূপ। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবৃত্তি। তবুও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে মাত্র কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাস ছাড়া তার রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই কেন? এই প্রশ্ন আমাদের নিয়ে যায় একটিমাত্র সিদ্ধান্তের

দিকে। তা হল, "জগদীশ গুপ্তের অসহ্য মৌলিকতা।" (জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)

গার্হস্থ্য জীবনের স্বাভাবিক নক্সাই এঁকেছেন জগদীশ গুপ্ত। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মা-বোন ইত্যাদি সম্পর্কের কাঠামোটি পরিচিত ও পুরোনো। কিন্তু এদের সম্পর্কের অন্তরালে প্রবৃত্তি চালিত যে অনাবিষ্কৃত জগত রয়েছে, তার স্বরূপ প্রকাশ করাই তিনি তার সাহিত্য জীবনের লক্ষ বলে গ্রহণ করেছিলেন। যৌনানুভূতির তীব্রতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছেন মানব মনের মূল বৃত্তি হিসাবে। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পেলব সম্পর্কের অন্তরালে এই দুই প্রবৃত্তির তীব্রতা পর্যবেক্ষণ করে রচনায় সার্থক প্রয়োগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মানব মনের দু'টি মৌলিক প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ মনে আসে— কামপ্রবৃত্তি ও মৃত্যু চেতনা। জগদীশ গুপ্তের গল্পেও দেখি এ দু'টির নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্য ক্ষণপ্রভার উন্মাদাবস্থার প্রাথমিক কারণই তার জৈব প্রবৃত্তির অপূর্ণতা। এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল যে মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই বুড়ি। এখানেই এসেছে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গি। একটি চিঠিতে ফ্রয়েড লিখেছেন, Don't forget that beauty stays only a few years and that we have to spend a long life together. Once the smoothness and freshness of youth is gone then the only beauty lies where goodness and understanding transfigure the features and that is where you excel!" জগদীশ গুপ্তের বর্ণিত সমাজ কলুষময়। সেখানকার বিবাহিত জীবন শুচিতাবিহীন, ইতর যৌন ক্ষুধায় জর্জর। মানুষের বিবেক চিরনির্বাসিত। তাই তো সম্পত্তির লোভে দীনতারণ ঘরে আনে প্রফুল্লকে, ক্ষণপ্রভা জীবিত থাকতেও। পুরুষের এই সর্বনাশা বুভুক্ষা নারীর জীবনে প্রতিফলিত হলে তার কী অবস্থা হবে? আর কোন রাস্তা তার সামনে খোলা থাকবে? মানুষের অসহায়তা যে কত তীব্র তা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি লেখক। যিনি মানুষকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে গল্প খোঁজেন আবার তিনিই নিয়তির কাছে বিমূঢ় মানুষের নিরলম্বতার উৎস খুলে দেন। পুনরায় মানুষের মধ্যকার প্রাধান্যে চিহ্নিত পুরুষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কাছে বিভ্রান্ত হয়ে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে ক্রীড়নকে পরিণত করে। স্বামী শয্যায় দেহ মন একমুখী করতে না পারার ফলেই ক্ষণপ্রভার এই মস্তিষ্ক বিকৃতি। লেখক সুনিপুণভাবে গল্পটিতে দেখিয়েছেন ক্ষণপ্রভার মানসিক বিবর্তন। যৌনানুভূতি দিয়ে তার বিবর্তনের শুরু। তাকে বলা প্রফুল্লের কথাগুলি, যেখানে দীনতারণের ছেলে পাবার আকুলতা ক্ষণপ্রভাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, "ক্ষণপ্রভার মনে হইতে লাগিল তাহার জীবন মিথ্যা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রীতি সব মিথ্যা সর্বোপরি সন্তান ধারণা মিথ্যা।" তার মনে এ ধারণা শেকড় গেড়ে বসল যে স্বামী তাকে গ্রহণ করে শুধুমাত্র ভোগের উপকরণ হিসেবে। ফলে স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা জন্ম নেয় প্রচণ্ড। এবং দীনতারণকে সে এক নারীমাংসলোভী পিশাচ ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারল না। ক্ষণপ্রভার এই যে মানসিকতার পরিবর্তন তার নীরব অথচ একমাত্র সাক্ষী শাশুড়ি সুভদ্রা। জগদীশ গুপ্ত নারী পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তিতে অতিরেক ঘটাননি, "এই দেহ উপলক্ষ আর অবলম্বন করিয়া পুরুষের যে যোগ আর মায়া উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত কেবল অধোদিকেই তার গতি।"? কিন্তু নারী পুরুষের সম্পর্কের যে ফল, সমাজের আশ্রয় হিসেবে মাতৃত্বের ধারণাটি তার রচনায় অতুলনীয় ভাবে উজ্জ্বল। 'দিবসের শেষে'র পাঁচুর মা, 'পয়োমুখম'-এর মাতঙ্গিনী উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গল্পেও তাই দেখি

সুভদ্রার মাতৃরূপ সমবেদনায় সোচ্চার। পুত্রবধূর জন্য তার মমতা ও আশঙ্কার শেষ নেই এই মমতার বসেই তিনি উপেক্ষিতা ক্ষণপ্রভাকে একরাত্রে ছেলের সমেত পাঠিয়েছিলেন দীনতারণের ঘরে। কিন্তু ততদিনে ক্ষণপ্রভা আর আগের ক্ষণপ্রভা নেই। তার মনে তখন তোলপাড়। স্বামীর প্রতি ঘৃণায় তার মন উত্থাল। দীনতারণ তখন তার কাছে, "কেবল একটা মাংসপিণ্ড... যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ।... তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হাঁ করিয়া আছে।" যে ক্ষণপ্রভা একসময় স্বামী সঙ্গের জন্য অপেক্ষা করত সেই স্বামী সহবাসেই তার কাছে মনে হচ্ছে কদর্য। কারণ দীর্ঘদিন সে তার নিজের বোনকেই দেখে আসছে স্বামীর বিছানায়, "স্বামী তাহাকে তাহার পুত্রসহ চাহেন নাই উহারই গর্ভের সন্তানটিকে কামনা করেছেন।"! সম্ভবত তাই ছেলেকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা ক্ষণপ্রভার আশা-আকাঙ্ক্ষা। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় উন্মাদাবস্থায়ও ছেলেটি তার কোলেই রয়েছে।

১২.৬ নামকরণ

'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পটি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর আত্মযন্ত্রণার গল্প। এই গল্পে আমরা প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসেবে পাই দীনতারণকে। সে বিবেকহীন, লোভী। ক্ষণপ্রভাকে বিয়ের পরে একটি সন্তান হলেও শুধুমাত্র বয়সের দোহাই দিয়ে পিতা মাতার নির্দেশে ক্ষণপ্রভার বোন প্রফুল্লকে সে বিয়ে করেছে। এই বিয়ের ক্ষেত্রে সে তার পিতা এবং পিতামহকেও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ তার পিতা এবং পিতামহ দু'বার করে বিয়ে করলেও প্রথম স্ত্রীর জীবনকালে কেউ তা করেননি। কিন্তু দীনতারণ প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শ্বশুরের সম্পত্তি পাওয়ার লোভে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয় যুবতী নারী ভোগের আকাঙ্ক্ষাও তার মনে কাজ করেছে বরাবর। প্রথম স্ত্রীর যন্ত্রণা তা'কে বিন্দুমাত্র আঘাত করেনি। ক্ষণপ্রভা স্বামী ও সন্তানকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছে কিন্তু দীনতারণ শুধুমাত্র দুই নারীকে নিয়ে ভালবাসার খেলায় মেতে উঠেছে। নিজেকে ছাড়া কাউকে সে ভালোবাসেনি। প্রতারণা করেছে আবার ভোগের লালসায় নিজের সন্তানকেও অবহেলা করেছে। তার মধ্যে পিতৃত্ব বলে কিছু ছিলই না। গল্পে দীনতারণ এক বিকৃত লোভী পুরুষ। তার কাছে সম্পত্তি আর দেহজ ভোগ ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুরই মূল্য ছিল না। পুরুষের জৈবিক প্রবৃত্তি যেন চন্দ্র সূর্যের মতোই চিরসত্য, শাশ্বত। আদি অনন্তকাল ধরে পুরুষের রক্তে বহমান হয়ে চলেছে তাদের এই বিকৃত নগ্ন জৈব প্রবৃত্তি যা কোনদিনই শেষ হবার নয়। গল্পের চন্দ্র সূর্য যতদিন নামকরণের মধ্য দিয়েই লেখক এমনই এক ব্যঞ্জনা দিয়েছেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পের নামকরণ সার্থক কী না আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

১২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- গল্পকার জগদীশ সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- জগদীশের গল্পশৈলী সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- গল্পটির চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- গল্পে উল্লিখিত দেশভাগ সম্পর্কে জানতে পারলেন।

১২.৮ অতিরিক্ত পঠন

- গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ (২০১৪) ছোটগল্পের সীমারেখা; কলকাতা : দে'জ
- ঘোষ বিনয় (২০১৪) মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত-বিদ্রোহ; কলকাতা : দীপ প্রকাশন
- চৌধুরী ভূদেব (১৩৭২বঙ্গাব্দ); বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- দাশ শিশিরকুমার (২০১২); বাংলা ছোটগল্প; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৯) কালের পুত্তলিকা; কলকাতা : দে'জ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (১৪১৭বঙ্গাব্দ) ছোটগল্পের প্রতিবেদন; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (২০০৬); প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; কলকাতা : দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ); দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য; কলকাতা : দে'জ

১২.৯ : অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

(১) নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পটি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর আত্মযন্ত্রণার গল্প।..... গল্পের চন্দ্র সূর্য যতদিন নামকরণের মধ্য দিয়েই লেখক এমনই এক ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। - এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১২.৬)

১২.১০ আর্দশ প্রশ্নাবলি

(১) 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' গল্পের নামকরণ সার্থকহয়েছে কিনা, এই সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) "প্রফুল্লের প্রতি স্নেহ কিংবা সন্তান বাৎসল্যের প্রাবল্যের জন্য নয়, জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্ষণপ্রভা উন্মাদ হয়ে গেছে।" গল্পটি অবলম্বনে সত্যতা নিরুপণ করুন।

(৩) 'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পটির অপ্রধান চরিত্রগুলি আলোচনা করুন।

*** *** ***